DEPT-POLITICAL SCIENCE

POL-H-CC-T-9 (4TH SEM)

UNIT -4

Citizen charter in India

ভারতের সংবিধানে ভারতকে সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, প্রজাতন্ত্র হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক, ন্যায় চিন্তার স্বাধীনতা, মতপ্রকাশে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে ।এখানে ব্যক্তির মর্যাদা এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতির বিষয়কে স্বীকৃতি জানানো হয়েছে। সংবিধানে মৌলিক অধিকার এবং রাষ্ট্র পরিচালিত নির্দেশমূলকনীতিতে সংবিধানের প্রণেতাগন কোন দেশের অভ্যন্তরে সামাজিক কাঠামোতে অবস্থিত থেকে সমস্ত রকম বৈষম্যের অবসান ঘটাতে চেয়েছিলেন এবং গণতান্ত্রিক কল্যাণকামী রাষ্ট্রে পরিণত করতে চেয়েছেন।

এই বিষয়ইটি বাস্তবায়িত করার জন্য প্রয়োজন একটি দক্ষ কার্যকরী এবং স্থিতিশীল প্রশাসনের প্রতিক্রিয়াশীল এবং অংশগ্রহণমূলক প্রশাসনের কাঠামোর মধ্যে দিয়ে ভারতীয় নাগরিকে বিভিন্ন পরিষেবা প্রদান করা সম্ভব হবে এবং প্রশাসনের মধ্যে তারা নিজেদের একাত্ম করে গড়ে তুলতে পারবে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যর্থতার কারণে ভারতীয় প্রশাসন সমালোচকদের সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকেই প্রশাসনের সমস্যা গুলি দূর করার জন্য একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং সংবেদনশীল এবং দায়বদ্ধ আমলাতন্ত্র গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতিগত সংস্কার সাধন করা হয়েছে এই সংস্কারের মূল কেন্দ্রে রয়েছে নাগরিকরাই।সংস্কার সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যাবলী এবং কমিটির সুপারিশগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে রূপায়নের চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রশাসনের এই ক্ষমতা কে সামনে রেখে গোটা বিশ্বজুড়ে প্রশাসনের আলোচনা বিভিন্ন রকমের নীতি এবং ধারণা গড়ে উঠেছে। ভারতের প্রশাসনের এই ব্যর্থতাকে সামনে রেখে প্রশাসনের একটি পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। প্রশাসনের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করতে এবং বেসরকারি করনের চাপ থেকে মুক্তি পেতে ভারতীয় প্রশাসন উদ্যোগী হয়েছে ।এই ধারণাটি ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে যে বেসরকারি এবং পৌর সমাজ প্রতিষ্ঠানগুলি কখনোই রাষ্ট্রের বিকল্প হতে পারে না। অধিকাংশ দেশের প্রশাসনই প্রশাসনিক দায়িত্বশীলতা ও জনগনের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন প্রশাসনিক সংস্কার গ্রহণ করছে। এক্ষেত্রে Citizen’s charter বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতে পঞ্চম বেতন কমিশন সরকারের সংখ্যাগত সংকীর্ণায়ন, স্বচ্ছতা, উন্মুক্ততা, মিতব্যয়িতা, বেসরকারিকরণ, চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের মাধ্যমে ব্যয়সংকোচন এবং কার্যকারিতা বৃদ্ধির ওপর জোর দেয়। এই বেতন কমিশনের প্রতিবেদনে openness তথা উন্মুক্ততা বলতে যা বোঝানো হয়েছে তা হল "Giving everyone the right to have access to information about the various decisions taken by the government and the reasing behind then (Fifth Pay Commission,

Vol. 1, 1997, p. 150)। এই সূত্র ধরেই আমলাতন্ত্রের সংকীর্ণায়ন এবং নাগরিক বান্ধব রাষ্ট্র গড়ে তোলার ওপর ভারত সরকার জোর দেয়। ২০০০ সালের মধ্যে ভারত সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ও সংস্থা ৪৯টি নাগরিক সনদ প্রণয়ন করে। ১৯৯৯-২০০০ সালের বাৎসরিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে ভারত সরকারের Personnel, Public Grievances and Pensions মন্ত্রক কিছু মডেল সনদ গড়ে তুলে স্বাস্থ্যবিভাগ এবং জনবিতরণ ব্যবস্থাকে দায়বদ্ধ করে তোলার চেষ্টা করে (TPDS)।

জনপ্রশাসনের পরিচ্ছন্নতা ও কার্যকারিতার ওপরে আস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য ১৯৯৬ সালের নভেম্বর মাসে মুখ্যসচিবের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের প্রারম্ভিক ভাষণে প্রধানমন্ত্রী দক্ষ, পরিচ্ছন্ন, দায়বদ্ধ ও নাগরিক বান্ধব প্রশাসন গড়ে তোলার ওপরে জোর দেন এবং এই মর্মে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছার ও দায়বদ্ধতার ওপরে গুরুত্ব আরোপ করেন। এই সম্মেলনে উদ্ভূত বিষয়গুলির ওপরে ১৯৯৭ সালের মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলনে আলোকপাত করা হয়। প্রথমোক্ত সম্মেলনে গৃহীত Action Plan যে বিষয়গুলির উল্লেখ করে তা হল ঃ

ক. জনগণের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার বৃদ্ধির জন্য দীর্ঘকালীন ও স্বল্পকালীন পরিকল্পনা গ্রহণ ;

খ. প্রত্যেক মন্ত্রক বা বিভাগের অন্তর্বর্তী আয়-ব্যয় ও কাজের হিসাব দাখিলের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ ;

গ. নাগরিক সনদের মাধ্যমে নাগরিকের ক্ষমতায়নের চেষ্টা ;

ঘ. সমস্ত প্রক্রিয়াটির নিয়মিত তদারকীর জন্য ক্যাবিনেট সচিবালয়ের অভ্যন্তরে Core Group, তথা কেন্দ্রীয় গোষ্ঠী গঠন।

১৯৯৭ সালের মুখ্যমন্ত্রীর দায়বদ্ধ ও নাগরিক বান্ধব প্রশাসন, গঠন, স্বচ্ছতা ও তথ্যের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং রাষ্ট্রকৃত্যকের পরিচ্ছন্ন কর্ম সম্পাদনের উদ্দেশ্যে এককালীন ও দীর্ঘকালীন Action Plan-এর কথা বলা হয়।

নাগরিক সনদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা যেতে পারে—

১. নাগরিক সনদ আদালতে বিচারযোগ্য নয়, এটি নৈতিক প্রতিশ্রুতি মাত্র ;

২. জনগণকে উপভোক্তা হিসেবে গ্রহণ করে নাগরিক সনদ পরিষেবার মানের মূল্যায়নের ব্যবস্থা করে ও পরিষেবার গুণগতমান বৃদ্ধিতে সহায়তা করে ;

৩. জনগণের চাহিদার রক্ষক হিসেবে নাগরিক সনদ জনগণের তৃপ্তির ধারক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে ;

৪. উপভোক্তাদের অভিযোগের শুনানি ও প্রতিকারের ভিত্তি হিসেবে নাগরিক সনদ কাজ করে ;

৫. নাগরিক সনদ নাগরিককে প্রশাসনের কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত করে ;
৬. নাগরিক সনদ নাগরিককে সক্রিয়তা দেয়।

ভারতের নাগরিক সনদের কয়েকটি উদাহরণ—

- LIC—উপভোক্তাকে সচেতন করা।
- TPDS, Ministry of Consumer Affairs—যথামূল্যের দোকান, রেশন কার্ড, গুণ ও পরিমাণ সংক্রান্ত তথ্য সঞ্চালন ও নাগরিক দায়িত্বশীলতা।
- CPWD—গুণগত মান রক্ষা, অভিযোগ প্রতিকার।
- ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া—স্বচ্ছতা, সকলীকৃত পরিষেবা ও অভিযোগের প্রতিকার ইত্যাদি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ভারতে ২০০৫, মার্চ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের ১০৭টি নাগরিক সনদ আছে। বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের এরূপ ৬২৯টি সনদ আছে। এরূপ নাগরিক সনদ রূপায়ণের জন্য Capacity Building Workshops অনুষ্ঠিত হয়।

২০০২-০৩	দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা
হিমাচল প্রদেশ	Institute of Public Administration, HP,
মধ্যপ্রদেশ	Noronha Academy of Administration, Bhopal,
মহারাষ্ট্র	Yashwantrao Chavan Academy of Development Administration, Pune,
নিউ দিল্লি	Indian Institute of Public Administration, New Delhi.

এছাড়া নাগরিক সনদ সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য বিভিন্ন পুস্তিকা রচনা ও প্রশিক্ষকের প্রশিক্ষণের জন্য কর্মশালার আয়োজন নিউ দিল্লির Indian Institute of Public Administration-এ করা হয়। ২০০২ সালের ডিসেম্বর মাসে আয়োজিত এই কর্মশালায় ১৫টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং ৫টি কেন্দ্র সরকারি সংস্থা যোগ দেয়।

২০০৩-০৪	দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা
পশ্চিমবঙ্গ	Administrative Traning Institute, Kolkata,
উত্তরাঞ্চল	Administrative Traning Institute, Nainital,
রাজস্থান	HCM Rajasthan State Institute of Public Administration, Jaipur

প্রশিক্ষকের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় মুসৌরির লাল বাহাদুর শাস্ত্রী National Academy of Administration এবং Indian Institute of Public Administration, নিউ দিল্লিতে।

২০০৪-০৫	দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা
উত্তরাঞ্চল	Academy of Administration, Nainital,
রাজস্থান	HCM Rajasthan State Institute of Administration, Jaipur,
অসম	Administrative Staff College, Guwahati.

নাগরিক সনদের সুষ্ঠু রূপায়ণের পথে যেসকল অন্তরায়গুলি লক্ষ করা যায়, তা হল ঃ

১. পরামর্শ প্রক্রিয়ায় ত্রুটি ;
২. যথাযথ প্রশিক্ষণের অভাব ;
৩. যথাযথ অভিমুখীকরণের অভাব ;
৪. সচেতনতার সম্যক অভাব ;
৫. প্রতিশ্রুতিতে বাস্তবগ্রাহ্যতার অভাব ;
৬. নাগরিক সনদ সম্বন্ধে অস্পষ্টতা ;
৭. আমলাতান্ত্রিক রক্ষণশীলতা প্রভৃতি।

গ্রেট ব্রিটেনের সরকার ১৯৯২ সালে একটি Charter Mark গ্রহণ করে, যা হল নিম্নরূপ ঃ

১. কাজের মান ;
২. তথ্য ও উন্মুক্ততা ;
৩. পছন্দ ও পরামর্শ ;
৪. সৌজন্য ও সহায়তা ;
৫. সঠিক পথে গমন ;
৬. অর্থের যথার্থ মূল্য ;
৭. ব্যবহারকারীর তৃপ্তি ;
৮. পরিষেবার মানোন্নয়ন ;
৯. পরিকল্পিত উন্নয়ন ও সৃজনশীলতা।

এই ব্যবস্থার অনুসরণে ভারতেও Charter Mark গ্রহণ করা হয়। নাগরিক সনদে যে উপাদানগুলির অন্তর্ভুক্তি আবশ্যিক বলে বিবেচিত হয় তা হল ঃ

১. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের বিবরণী ;
২. সংস্থার কাজের বিবরণ ;
৩. গ্রাহকের বিস্তারিত বিবরণ ;
৪. গ্রাহকের জন্য নির্দিষ্ট পরিষেবার বিবরণ ;
৫. অভিযোগ প্রতিকার সংক্রান্ত প্রক্রিয়ার বিস্তারিত বিবরণ ;
৬. গ্রাহকের কাছ থেকে প্রত্যাশা।

নাগরিক সনদের সাফল্যের পূর্বশর্তগুলি হল ঃ

১. সরল ভাষা ;
২. বিশেষজ্ঞের দ্বারা সনদ রচনা ও এপ্রসঙ্গে প্রয়োগকারীর পরামর্শ গ্রহণ ;
৩. সংবেদনশীল বাতাবরণ তৈরির জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ ;
৪. পরিষেবা সম্বন্ধে স্পষ্ট বক্তব্য ;
৫. ভুল সংশোধন সম্বন্ধে স্পষ্ট বক্তব্য ;
৬. মূল্যায়নের উপযুক্ত ব্যবস্থা, ইত্যাদি।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রশাসন পরিচালিত হয় জনগণের প্রতি দায়িত্বের কথা মাথায় রেখে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ জনপ্রতিনিধি হিসেবে প্রশাসন পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন দপ্তরের কর্মদায়িত্ব সম্পাদনের সময়ে জনকল্যাণের সঙ্গে সঙ্গতি রাখবেন, এই প্রতিশ্রুতিতেই তাঁরা নির্বাচিত হন; কিন্তু ক্ষমতাসীন হওয়ার পর জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতে জনগণের সঙ্গে দূরত্ব সৃষ্টি হয় অথবা পরিস্থিতির চাপে মন্ত্রীদের অসহায়তা জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। প্রশাসনের অরাজনৈতিক অংশকে নিয়ন্ত্রণ করে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, কিন্তু রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অনভিজ্ঞতা ও অদক্ষতার সুযোগ নিয়ে আমলা ও প্রশাসনিক কর্মীরা নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থে বা আমলাতান্ত্রিক আত্মম্ভরিতায় প্রশাসনিক পরিকাঠামোকে এমনভাবে ব্যবহার করে, যা প্রশাসনের সঙ্গে জনগণের বিচ্ছিন্নতা তৈরি করে। বিশ্বায়ন, উদারীকরণ ও বেসরকারিকরণ যে বাজার অর্থনীতির দ্বার উন্মুক্ত করেছে, তা ক্রমে নাগরিককে প্রশাসনের কেন্দ্রে নিয়ে এসেছে। নাগরিক একদিকে যেমন উপভোক্তা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, অন্যদিকে সাইবারনেটিক রাষ্ট্রের জনগণ নিজের চাহিদা ও অবস্থান সম্বন্ধে সচেতন হতে শুরু করেছে। ক্রমেই জনগণের প্রতি দায়িত্বশীল প্রশাসন গড়ে তোলার জন্য সরাসরি নাগরিক নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তাই অনুভূত হয়েছে। মন্ত্রী, আমলা, পুলিশ অধিকর্তা ও কর্মী, সাধারণ প্রশাসন কর্মী প্রভৃতি সকলকে জনসাধারণের কাছে দায়িত্বশীল করার প্রক্রিয়া শুরু হয়, যাতে কালের গতিতে প্রশাসনিক অচলাবস্থা সৃষ্টি না হয়। নিয়ন্ত্রণ কার্যকরী হলে গণমুখী প্রশাসন গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

গণমুখী প্রশাসন গড়ে তুলতে হলে জনসংযোগ বৃদ্ধি করতে হবে। জনসাধারণের আস্থা অর্জন বা উপভোক্তার পরিতৃপ্তি সরকারি প্রশাসনের সাফল্যের পূর্বশর্ত। এই উদ্দেশ্যে সরকারি প্রশাসন সম্বন্ধে একটি দায়িত্বশীল ভাবমূর্তি গড়ে তোলা আবশ্যক। উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা মন্ত্রী ও আমলা উভয়ের মধ্যে নিরাপত্তার অভাব তৈরি করে ও সার্বিক সামাজিক অস্থিরতা ও দুর্নীতি প্রবণতার সঙ্গে এঁদের মধ্যেও নীতিহীনতা ক্রমেই বাড়তে থাকে। আত্মনিয়ন্ত্রণ যেখানে

শিথিল হয়ে যায়, সে
রাষ্ট্রব্যবস্থায়ও ক্ষমতা
অপেক্ষাকৃত বেশি ব
নেওয়া হয়।

শাসন বিভাগের
নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা
জনপ্রতিনিধি কক্ষ
আলোচনা, কমিটি
করে। ভারতে কে
শাসনবিভাগকে প্র
নিয়ন্ত্রণ করা হয়।
এবং কমিটি ব্যব
গঠনের মাধ্যমেও
আরোপ করার
ভারতে শাসনবি
প্রশাসনিক ট্রাই

উপরিউক্ত
আইনবিভাগ ও
শাসনবিভাগীয়
কিন্তু সাধারণ
স্বার্থগোষ্ঠী অ
সংগঠন ইত্যা
মধ্যেই সীমা
যাচ্ছে, যদিও
বিভিন্ন সভা,
নিয়ন্ত্রণ জারি
দূরদর্শনে এ
সাধারণ কর্ম
ক্ষমতার অ
'ওম্‌বাড্‌সম
প্রয়োজনীয়

শিথিল হয়ে যায়, সেখানেই শুরু হয় বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা। উন্নত রাষ্ট্রব্যবস্থায়ও ক্ষমতা অপব্যবহারের নজির বিরল নয়, তবে সেখানে জনমতের চাপ অপেক্ষাকৃত বেশি বলে মন্ত্রী ও অন্যান্য পদাধিকারীরা কিছুটা সংযত বলে ধরে নেওয়া হয়।

শাসন বিভাগের রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক অংশের ওপর সর্বাপেক্ষা কার্যকরী নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে আইনসভা। যে কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইনসভার জনপ্রতিনিধি কক্ষ সরকারি কার্য সম্পাদনের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখে এবং বিতর্ক, আলোচনা, কমিটি স্তরে পর্যালোচনা প্রভৃতির মাধ্যমে সরকারি কার্যকলাপের মূল্যায়ন করে। ভারতে কেন্দ্রে লোকসভায় ও রাজ্যে বিধানসভায় যথাক্রমে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য শাসনবিভাগকে প্রশ্নোত্তর, দৃষ্টি আকর্ষণ, নিন্দা প্রস্তাব, অনাস্থা প্রস্তাব প্রভৃতির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। সরকারের আয়-ব্যয়ের ওপরেও নিয়ন্ত্রণ জারি করা হয়ে থাকে এবং কমিটি ব্যবস্থার মাধ্যমে এই নিয়ন্ত্রণ যথেষ্ট বাস্তবসম্মত হয়ে ওঠে। জনমত গঠনের মাধ্যমেও আইনসভা এই নিয়ন্ত্রণ কার্যকর করে। শাসনবিভাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার ক্ষেত্রে আদালত একটি বিশেষ কার্যকরী মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। ভারতে শাসনবিভাগের নির্দেশের সাংবিধানিক বৈধতা বিচার সুপ্রিমকোর্ট করতে পারে। প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালও এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

উপরিউক্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাগুলো যথেষ্ট কার্যকর হলেও ব্যক্তির একক প্রচেষ্টায় আইনবিভাগ ও বিচারবিভাগের নিয়ন্ত্রণকে কার্যকরী করা যায় না। পিটিশনের মাধ্যমে শাসনবিভাগীয় অবিচারের বিরুদ্ধে আদালতের কাছে প্রতিকার চাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে তা ব্যয়সাপেক্ষ ও জটিল হয়ে যেতে পারে। বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠী অনেকসময়ে সক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে, যেমন ছাত্র সংগঠন, শিক্ষক সংগঠন ইত্যাদি, যদিও এই ধরনের নিয়ন্ত্রণও সীমিত সংখ্যক সমস্বার্থ সম্পন্ন ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। বর্তমানে নাগরিক কমিটি গড়ে তোলার প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে, যদিও তার কার্যকারিতা ও নিরপেক্ষতা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ থেকেই যায়। বিভিন্ন সভা, সমিতি, আলোচনাসভা, গণমাধ্যম প্রভৃতির মাধ্যমে নাগরিকগণ কার্যকরী নিয়ন্ত্রণ জারি করতে পারে। ভারতে প্রসার ভারতী আইন কার্যকর হওয়ার পরে দূরদর্শনে এমন কিছু অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হচ্ছে যার মাধ্যমে মন্ত্রী থেকে শুরু করে সাধারণ কর্মী পর্যন্ত সকলকেই প্রশ্ন করা হচ্ছে। কিন্তু প্রশাসনিক দুর্নীতি, অবিচার ও ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে সর্বাধিক কার্যকরী নিয়ন্ত্রণ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে 'ওম্বাড্‌সম্যান ব্যবস্থা'। ১৯৬৩ সালে রাজস্থান সংস্কার কমিটি ওম্বাড্‌সম্যানের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে।